৬. মৌর্য শাসনব্যবস্থা

গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যতম প্রধান শক্তি থেকে মগধ একটি পরাক্রমশালী সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। ধারাবাহিক সামরিক সাফল্য ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার ফলে এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল। দক্ষ সেনাবাহিনী ও অভিজ্ঞ আমলাতন্ত্র মৌর্য শাসনব্যবস্থার

ভিত্তি গড়ে তোলে। চন্দ্রগুপ্ত প্রবর্তিত ব্যবস্থা ও পরবর্তীকালে অশোকের সংযোজন—এ দুই প্রচেষ্টার ফলে মৌর্য শাসনতান্ত্রিক কাঠামোটি রচিত হয়।

(ক) ঐতিহাসিক উপাদান ঃ মৌর্য শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রধান ঐতিহাসিক উপাদানগুলি হল ঃ (১) গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণী ইন্ডিকা। (২) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, (৩) দিব্যাবদান ও মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থদ্বয়, (৪) অশোকের শাসনকালে উৎকীর্ণ শিলালেখ ও খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে শকরাজ রুদ্রদামন কর্তৃক উৎকীর্ণ গিরনার শিলালেখ, (৫) অনুসন্ধান ও উৎখনন থেকে প্রাপ্ত সমকালীন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন।

(খ) কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ঃ মৌর্য শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাজতন্ত্র। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক, জ্যেষ্ঠপুত্র সাধারণত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতেন। অর্থশাস্ত্রে রাজার গুণাবলী ও যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে রাজা হবেন অদীর্ঘসূত্রী ও মহোৎসাহসসম্পন্ন। সেনাবাহিনী ও কোষাগার ছিল রাজার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি ছিলেন একাধারে সর্বোচ্চ শাসক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি ও প্রধান আইনপ্রণেতা। পদস্থ আমলাদের তিনি নিযুক্ত করতেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শোনা ছাড়াও তিনি অভিযুক্তদের বিচার করে শাস্তিবিধান করতেন। রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করতেন, সেনাপতিদেরও জরুরী নির্দেশ দিতেন। তিনি প্রয়োজনে মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। মৌর্যরাজগণ কখনও স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেননি। প্রজাকল্যাণসাধন ছিল প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

মৌর্য শাসনব্যবস্থায় এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রী পরিষদ ছিল। এর সদস্য ছিলেন যুবরাজ, প্রধানমন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ। মন্ত্রী পরিষদের সভায় ঐকমত্য না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গৃহীত হত। রাষ্ট্রের কল্যাণের স্বার্থে রাজা যে-কোন মত গ্রহণ করতে পারতেন। মন্ত্রী পরিষদে গৃহীত নীতি রূপায়ণের দায়িত্ব ছিল অমাত্যবর্গের ওপর। শাসনব্যবস্থার সমন্বয়সাধনের জন্য অশোক অনুশাসনের মাধ্যমে রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিতেন।

অর্থশাস্ত্রে যাদের অমাত্য বা সচিব বলা হয়েছে বা মেগাস্থিনিস যাদের উপদেষ্টা ও রাজস্ব-সংগ্রাহক আখ্যা দিয়েছেন, মৌর্যরাষ্ট্রে তারাই প্রকৃত শাসকশ্রেণী। অশোকের শাসনকালে এরাই ছিল মহামাত্র। এই সময় ধর্মমহামাত্র, অন্তমহামাত্র, স্ত্রী অধ্যক্ষ-মহামাত্র প্রভৃতি উচ্চ পদাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রে মৌর্য আমলাতন্ত্রের স্তরবিন্যাসের উল্লেখ আছে। প্রধান পুরোহিত, প্রধান সেনানী ও যুবরাজের মতো পদাধিকারীগণ ছিলেন উচ্চতম বেতনভোগী। পদাতিক সৈনিকের বেতন ছিল নিম্নতম। বেতনক্রমের বিন্যাসের দ্বারা আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

(গ) প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ঃ মৌর্য সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রথম, উত্তরাপথ, রাজধানী তক্ষশিলা; দ্বিতীয়, কলিঙ্গ, রাজধানী তোসালি; তৃতীয়, অবন্তীরট্ঠ, রাজধানী উজ্জয়িনী; চতুর্থ, দক্ষিণাপথ, রাজধানী সুবর্ণগিরি; পঞ্চম, প্রাচ্য, রাজধানী পাটলিপুত্র। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হতেন। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির দায়িত্ব সাধারণত রাজপুত্রদের হাতে ন্যস্ত হত। শাসনকর্তাদের দায়িত্ব ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্বসংগ্রহ, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং সামন্ত ও দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। একটি অমাত্য পরিষদ তাঁকে কর্তব্যপালনে সহায়তা করত।

মৌর্য প্রদেশগুলি কতকগুলি 'বিভাগে' ও বিভাগ কতকগুলি জেলা বা 'আহারে' বিভক্ত ছিল। বিভাগের শাসনকর্তাকে বলা হত 'প্রদেষ্ট' ও আহারের শাসনকর্তা 'রজ্জুক'।

প্রদেষ্টর কাজ ছিল প্রশাসনিক, রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত। রজ্জুকের প্রধান কাজ রাজস্ব সংগ্রহ হলেও তাকে বিচার বিভাগীয় ও প্রজাকল্যাণমূলক দায়িত্বও পালন করতে হত। 'দণ্ডসমতা' ও 'ব্যবহারসমতা' বজায় রেখে তাকে কাজ করার নির্দেশ অশোক দিয়েছিলেন। আহার বিভক্ত ছিল 'স্থানীয়'তে, স্থানীয় 'দ্রোণমুখে', দ্রোণমুখ 'খার্বটিকে' ও খার্বটিক 'সংগ্রহণে' বিভক্ত ছিল। দশটি গ্রাম নিয়ে একটি সংগ্রহণ গঠিত হত। 'গ্রামিক' গ্রামের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকত, রাজস্বের দায়িত্বে ছিল 'গোপ'। গ্রাম পর্যায়ের এই কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান করত 'সমাহতৃ'। স্বশাসিত নগরের অস্তিত্ব ছিল। মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রের মতো নগরের জন্য তিরিশ সদস্যের এক সমিতির উল্লেখ করেছেন। সমিতি শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা, বিদেশীদের দেখাশুনা, জন্মমৃত্যুর হিসাব রক্ষা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করত। তক্ষশিলা, ত্রিপুরী ও উজ্জয়িনীর মতো নগরীর নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল।

(ঘ) বিভিন্ন দপ্তর ঃ অর্থশাস্ত্রের 'অধ্যক্ষপ্রচার' শীর্ষক অধিকরণে মৌর্যযুগের সরকারি বিভাগ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। অন্তঃপুরাধ্যক্ষের অধীনে রাজপ্রাসাদ ছিল একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। সেনাপতি বা বলাধ্যক্ষের অধীনে সামরিক বিভাগ পরিচালনা করত তিরিশ জনের এক সমিতি। এই সমিতি পাঁচ সদস্যের ছয়টি উপসমিতিতে বিভক্ত ছিল। এরা পদাতিক, অশ্বারোহী, রথবাহিনী, হস্তীবাহিনী, যোগাযোগ ও সরবরাহ এবং নৌবহর দেখাশুনা করত।

বৈদেশিক বিভাগের দায়িত্ব পালন করত বিভিন্ন পদমর্যাদার দূতরা। নিসৃষ্টার্থ দূত (পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন), পরিমিতার্থ দূত (যোগাযোগের দায়িত্বপ্রাপ্ত), শাসনাহার দূত (বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত) প্রভৃতি দূতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদেশ নীতিতে লোভবিজয় (শত্রুরাজ্য অধিকার), অর্থবিজয় (শত্রুকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা) ও ধর্মবিজয় (সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি) প্রভৃতি নীতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মেগাস্থিনিস জানিয়েছেন পাটলিপুত্রে বিদেশীদের দেখাশুনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল একটি সমিতির ওপর।

রাজস্ব বিভাগের প্রধান 'সমাহর্তা' নগদে বা দ্রব্যে শতকরা ১৫ থেকে ২৫ ভাগ ভূমিরাজস্ব আদায় করত। এছাড়া সেচকর, পথকর, বিপণিকর, পণ্যশুল্ক, বনাঞ্চল, খনি, পশুচারণ ও রাজার খাস জমি থেকে আয়, কারিগর-শিল্পীদের কাছ থেকে করসংগ্রহ প্রভৃতি সমাহর্তার দায়িত্ব ছিল। তাকে সহযোগিতা করত রাজকোষের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'সন্নিধাতা'। তার অধীনে ছিল কোষাগারাধ্যক্ষ ও কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ।

বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের দায়িত্ব ছিল শিল্পোৎপাদন, পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি, বাজার দর, ওজন ও পরিমাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ। পণ্যাধ্যক্ষ, মানাধ্যক্ষ, সূত্রাধ্যক্ষ, নাবধ্যক্ষ, মুদ্রাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ প্রভৃতি আমলা এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে আইনের ভিত্তি চারটি ঃ (১) ধর্ম (ধর্মশাস্ত্রের বিধি), (২) ব্যবহার (অর্থশাস্ত্রের বিধি যা সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত), (৩) চরিত্র (প্রচলিত রীতিনীতি ও স্থানীয় ট্রাডিশন), (৪) রাজশাসন (রাজার আদেশ)। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে ধর্মস্থীয় আদালতে দেওয়ানী ও কণ্টকশোধন আদালতে ফৌজদারী মামলার বিচার হত। রাজধানীতে ছিল রাজার অধীনে সর্বোচ্চ আদালত। গ্রামবৃদ্ধ নিয়ে গঠিত গ্রামীণ আদালত স্থানীয় বিরোধের মীমাংসা করত। জরিমানা, বেত্রাঘাত, অঙ্গচ্ছেদ, কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড ছিল স্বাভাবিক শাস্তি।

কারাবিভাগের দায়িত্বে ছিল 'প্রশাস্তা'। অশোকের রাজ্যাভিষেকবার্ষিকী উপলক্ষে লঘুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের মুক্তি দেওয়া হত।

পুরোহিত ছিলেন ধর্মানুষ্ঠানের দায়িত্বে। রাষ্ট্রের কল্যাণে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে তিনি যজ্ঞের আয়োজন করতেন। অশোকের রাজত্বকালে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে, প্রজাকল্যাণের স্বার্থে, জনসাধারণের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত রাখতে, পুরোহিতদের সহযোগিতা করতে ধর্মমহামাত্রদের নিযুক্ত করা হয়।

(ঙ) মৌর্য শাসনব্যবস্থায় অশোকের সংযোজন ঃ চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা থেকে অশোকের সময় পর্যন্ত কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। মৌর্য শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রাভিমুখী চরিত্র অশোকের সময়েও অপরিবর্তিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের স্বৈরক্ষমতার সঙ্গে অশোক কর্তব্যবোধ তথা পিতৃত্ববোধকে সংযোজন করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, সব মানুষই আমার সন্তান। রোমিলা থাপার মনে করেন 'দেবানাং পিয়' এই অভিধা গ্রহণ করে অশোক রাজশক্তির সঙ্গে দৈবশক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি পুরোহিততন্ত্রকে উপেক্ষা করেন। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অশোক নিজের কিছু উদ্ভাবন সংযোজন করেছিলেন।

অর্থশাস্ত্রের রাজা বিহারযাত্রা ও মৃগয়ায় গমন করতেন। অশোক এর পরিবর্তে ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুত, রজ্জুক, মহামাত্র প্রভৃতি কর্মচারী তিন ও পাঁচ বছর অন্তর অনুসংযান বা রাজ্য প্রদক্ষিণে বের হত। অশোক স্বয়ং এতে অংশ নিতেন।

ধর্মমহামাত্র, স্ত্রী অধ্যক্ষ-মহামাত্র ও ব্রজভূমিক, এই তিন শ্রেণীর রাজকর্মচারী অশোক নিযুক্ত করেন। এদের প্রধান কর্তব্য ছিল 'ধম্মে'র প্রতিষ্ঠা এবং দুঃস্থ, বৃদ্ধ ও ধার্মিক মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান। যবন, কম্বোজ ও গান্ধারদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ওপরও নজর দেওয়া হয়। স্ত্রী অধ্যক্ষ-মহামাত্র নারী কল্যাণের দায়িত্ব পালন করত। ব্রজভূমিক বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

অহিংস নীতিকে অশোক রাষ্ট্রনীতির পর্যায়ে উন্নীত করেন। যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করে ধর্মবিজয় নীতি গ্রহণ করায় বৈদেশিক সম্পর্ক নতুন রূপ নেয়। 'দণ্ড সমতা' ও 'ব্যবহার সমতা' নীতি সর্বত্র প্রবর্তিত হয়। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তিনদিনের বিশেষ সুবিধা পেত। প্রাণীহত্যা সীমায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সর্বোপরি অশোক চন্দ্রগুপ্তের কেন্দ্রাভিমুখী শাসনব্যবস্থার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের সংযোজন ঘটান। অশোক রজ্জুকদের বেশি স্বাধীনতা প্রদান করে কার্যত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের সূচনা ঘটিয়েছিলেন। বিচারকার্যে তাদের স্বাধীনতা ছিল লক্ষণীয়। অশোকের অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিল। ক্ষেত্র বিশেষে তারা রাজার বিরোধিতাও করত। অর্থাৎ একটি বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা অশোকের শাসনকালে শুরু হয়েছিল।

অর্থশাস্ত্রে নির্দেশিত মৌর্য স্বৈরতন্ত্রকে অশোক কিছু নীতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। ষষ্ঠ শিলালেখতে জনকল্যাণমূলক কাজের সমর্থনে অশোক প্রচার করেছেন, জনগণের কাছে তাঁর যা ঋণ আছে তা তিনি কিছুটা শোধ করতে চান। সর্বত্র তিনি জনগণের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত। দামোদর ধর্মানন্দ কৌশাম্বী মন্তব্য করেছেন, ভারতের রাজতন্ত্রের ইতিহাসে অশোকের এই আদর্শ অভিনব। অর্থশাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিল কারও কাছে রাজার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। কিন্তু প্রজাসাধারণের কাছে রাজকর্তব্যের কথা ঘোষণা করে অশোক রাজা ও প্রজার মধ্যে চুক্তির ওপর গুরুত্ব দেন।

(চ) মৌর্য শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ঃ মৌর্য শাসনব্যবস্থার মধ্যে একই সঙ্গে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ, উভয় প্রবণতাই উপস্থিত ছিল। রাজা ছিলেন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী,

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রকাশ। তাঁর ক্ষমতার ওপর দৃশ্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ভিনসেন্ট স্মিথ সেই কারণে মৌর্য রাজতন্ত্রকে 'সীমাহীন স্বেচ্ছাতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী অবশ্য দেখিয়েছেন, 'পোরান পকিতি' অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইন রাজা মানতে বাধ্য ছিলেন। মন্ত্রী পরিষদ ও অমাত্যবর্গ রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে রাখত। তাছাড়া জনগণের প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা রাজাকে স্বেচ্ছাচারী হতে দিত না। স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার আংশিক বিকেন্দ্রীকরণও রাজশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করত। অতএব মৌর্য শাসনব্যবস্থাকে উদার স্বেচ্ছাতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।